জাতির অগ্রগতিতে প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনীর ভূমিকা

আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়

১৮৬১ না ১৮৬২ কবে কাদম্বিনী এসেছিলেন উদারচেতা ব্রজকিশোর বসুর ঘরে বিহারের ভাগলপুরে না বরিশালের চাঁদসীতে, তা কেউ সঠিক বলতেই পারে না তারিখ মাসের তো কোনো হদিশই নেই। কিন্তু উনিশ শতকের সেই রেনেসাঁর সময় অনেক অনেক নক্ষত্রের শোভা যখন বাংলার আকাশকে উদ্ভাসিত করেছে সেই সময় কয়েকজন পুরুষ চাইলেন সাথে নারীদের নিয়ে এগিয়ে চলতে। যে আশ্চর্য তারকাটি সমগ্র নারীজাতিকে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সে কাদম্বিনী বসু গঙ্গোপাধ্যায়। কোথাও কোনো বাঁধা তাঁকে দমাতে পারেনি, হার স্বীকার করেননি কোথাও। সমগ্র জাতির সামনে এক দীপ্যমান শিখা জ্বালিয়ে রেখেছেন। মূলতঃ চিকিৎসায় তাঁর অসমান্য অবদান সাথে রাজনীতি, শিক্ষা সমাজসংস্কার, নারী প্রগতি সর্বত্র। তিনি সুগৃহিনী ও স্নেহশীলা মাতাও।

আমরা তাঁর সঠিক জন্মদিন জানি না তাই সারাবছরই তাঁকে সার্ধশতবর্ষের প্রণাম জানাব যে কোন দিনে।

কাদম্বিনীর সকল কাজের অদম্য উৎসাহের প্রেরণা ছিল স্বদেশসেবী ও নারীপ্রগতির স্তম্ভস্বরূপ স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৮৩ তে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম ভারতীয় পরীক্ষার্থিনী হিসাবে বি.এ পাশ করেন। এই বছরই তিনি তাঁর শিক্ষক দ্বারকানাথকে পতিত্বে বরণ করেন। দ্বারকানাথের মতো নারী হিতৈষী ব্যক্তি দুর্লভ ছিল, প্রতিভাময়ী কাদম্বিনীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় নিজের স্বপ্নকে সাকার করতে সক্ষম হন। সে যুগে স্বামীর আগ্রহ ছাড়া একজন মেয়ের স্বাধীনভাবে একটি পথ খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। এ যুগেও চরম সাফল্য পেতে হলে নারীপুরুষ উভয়েরই জীবনসঙ্গীর উৎসাহ ও প্রেরণা একান্তই জরুরি। সমসাময়িক অনেকের মতে কাদম্বিনীর অসাধারণ মেধার সাথে দ্বারকানাথের উৎসাহ ও প্রেরণা কাদম্বিনীর সফল জীবনের পাথেয়।

কলকাতা মেডিকেল কলেজেও তিনি প্রথম ছাত্রী। মেডিকেল কলেজের কাউন্সিল তাকে ভর্তি হতে দিতে চায় নি—অধ্যাপকদের অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন—তার জের হিসেবে ১৮৮৮ খ্রি. মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় একজন অধ্যাপক তাঁকে মেডিসিন-এ ফেল করিয়ে দেন। ফলে এম.বি. ডিগ্রি পান নি। জি. বি. এম. সি (গ্র্যাজুয়েট অব বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ) উপাধি পান। এই অপমান ভুলতে ১৮৯২ সালে ইংলন্ড যান। পরের বছর এল.আর.সি.পি (এডিনবরা) এল. আর.সি.এস গ্লাসগো এবং ডি.এফ.পি.এস (ডাবলিন) উপাধি নিয়ে ফেরেন।

সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী কাদম্বিনী অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মহিলা ছিলেন এবং চিকিৎসক হবার মতো যোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। সে যুগে পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে ক্লাস করতেন, কখনও অশালীন ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছিলেন এমন কথা শোনা যায় নি। লেডি ডাফরিনে মেয়েদের ডাক্তারি পড়া ও রোগিণীদের চিকিৎসার জন্য 'কাউন্টেস অব ডাফরিনস ফান্ড' নামে একটি তহবিল খোলেন। এই তহবিলে সাতলক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। কলকাতায় কাদম্বিনী একাই সংগ্রহ করেন চব্বিশ হাজার টাকা।

বঙ্গবাসী পত্রিকাগোষ্ঠী ভব্যতার সীমা না রেখে কাদম্বিনীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে। 'বঙ্গনিবাসী' পত্রিকার সম্পাদক মহেশ চন্দ্র পাল বাড়াবাড়ি করে গালাগালি দিলেন তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের জঘন্য নিদর্শন ও পতিতা বলে। কাদম্বিনী মেয়ে বলে সব ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। পিছনে ছিলেন দ্বারকানাথ, মানহানির মামলা করলেন বঙ্গনিবাসীর সম্পাদকের বিরুদ্ধে। জয়ী হলেন। সম্পাদকের ছ'মাসের কারাদণ্ড ও একশত টাকা জরিমানা হলো।

মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করতে না পারার দুঃখ ঘোচাতে গ্লাসগো ও এডিনবরা থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসার পর বিশেষ বাঁধা পান নি। শিক্ষিতদের কাছে পেয়েছিলেন সম্মান। যেখানে যেতেন সেখানেই অনেকে ভিড় করে তাঁকে দেখতে আসতো।

চন্দ্রমুখী বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা হয়েছিলেন প্রায় একই সময়ে, কাদম্বিনী ডাফরিন হাসপাতলে তিনশত টাকা মাইনের চাকরি পান। এত উচ্চহারে বেতন বাঙালি পুরুষেরাও সে সময় কমই পেতেন।

দ্বারকানাথ (১৮৪৪-৯৮) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা ও নারী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী ব্যক্তিত্ব। নারী মুক্তি ও বিধবা বিবাহের জন্য তাঁরা একযোগে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের মতো পণ্ডিত ও প্রখ্যাত শিক্ষকদের সুযোগ্য ছাত্রী কাদম্বিনী মনে করতেন উন্নত শিক্ষাই নারী সমাজের বাহন হতে পারে। তিনি বালিকা বিদ্যালয়গুলির কুটির শিল্প প্রসারে উৎসাহিত করেন।

কাদম্বিনী চাইলেন ভারতীয় নারীদের দৃষ্টি প্রসারিত হোক এবং এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং ইংলণ্ড ও আমেরিকার ঘটনাবলী বিচার বিশ্লেষণের জন্য Bengal Ladies Association-এ যোগ দেন। ১৮৮০ সালে তিনি এই সংস্থার সম্পাদিকা হন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগিদের মধ্যে চন্দ্রমুখী বসু, অবলা দাস, কামিনী রায় ও স্বর্ণকুমারীর নাম উল্লেখযোগ্য।

কাদম্বিনী একই সময়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে। বোম্বাইয়ের কংগ্রেস অধিবেশনে যে তিনজন বঙ্গনারী যোগ দিয়েছিলেন কাদম্বিনী তাঁদের একজন। অপর দুজন-স্বর্ণকুমারী দেবী ও বসন্তকুমারী দাস। এঁদের মধ্যে একমাত্র কাদম্বিনীই উক্ত সভায় কিছু বক্তব্য রাখেন।

বাঙলায় মেয়েদের মধ্যে কাদম্বিনী প্রথম চিকিৎসক। আনন্দবাঈ যোশী পেনসিলভানিয়া থেকে ডাক্তার হয়ে এসেছিলেন কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁকে চিকিৎসা করবার সুযোগটাই দিল না। অবলা দাস মাদ্রাজে গিয়েছিলেন মেডিকেল পড়তে দিদির মতো তাঁরও বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়া হয় নি। কাদম্বিনীর বি.এ পাশ করার পরই বিয়ে হয় দ্বারকানাথের সঙ্গে তবু লেখাপড়ায় ছেদ পড়লো না। ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। সংসার দেখা সন্তান পালন তার সঙ্গে ডাক্তারি সবই একযোগে নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেলেন কাদম্বিনী। দ্বারকানাথের প্রথমা স্ত্রীর কন্যা বিধুমুখীর বিয়ে হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে। কাদম্বিনী নিজের কথা না লিখলেও নাতনি অর্থাৎ বিধুমুখীর মেজো মেয়ে পুণ্যলতার কলমে কাদম্বিনীর স্নেহময়ী জননী রূপটি ফুটে উঠেছে।

দিদিমা কবে যে বিলেত গিয়েছিল মনে নেই, কিন্তু তাঁর ফিরবার দিনটি বেশ মনে পড়ে। বাড়িতে ঢুকেই দুহাত বাড়িয়ে জংলুমামাকে কোলে নিতে গেলেন। ছোট্ট একবছরের জংলুমামাকে তাঁর মায়ের কাছে রেখে দিদিমা বিলেত চলে গিয়েছিলেন, এখন সে ছেলে মাকে চিনতে পারছে না।

বিলেত থেকে আসার সময় কাদম্বিনী ছোটোবড়ো সকলের জন্য কিছু না কিছু উপহার এনেছিলেন। একদিকে খুব সাহসী আর তেজস্বিনী অন্যদিকে ভারী আমুদে মানুষ কাদম্বিনীকে সকলেই ভালোবাসতেন। তাঁর লাবণ্যময় ব্যক্তিত্ব সকলকে মুগ্ধ করে রাখতো। পুণ্যলতার ভাষায় মাতৃভাষার মতন সুন্দর অনর্গল ইংরেজি বলতে পারতেননা তখনকার সবচেয়ে আধুনিক ফ্যাশনের শাড়ি জামা জুতো পরে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতেন। তা বলে ঘরের কাজেও বিরাম ছিল তা না। রান্না, সেলাই সবই জানতেন। একটুও সময় নষ্ট করতেন না। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর সাতটি ছোটো ছোটো সন্তানকে একাই মানুষ করেছিলেন অনায়াসে। তিনি যে বিধুমুখীর বিমাতা সে-কথা পুণ্যলতা বুঝতে পারতেন না। শুধু দেখতেন ঘরের কাজ, দেশ সেবা, সমাজ সেবা, ডাক্তারি লেসবোনা সবই সমানতালে এগোচ্ছে।

পুণ্যলতার শিশুমনের পটে কাদম্বিনীর জীবন চিত্রের যে কোমলরেখা ধরা পড়েছে তার মূল্য অপরিসীম। কাদম্বিনী একবার নেপালের রাজমাতাকে চিকিৎসা করে মরণাপন্ন অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁরা খুশি হয়ে নির্দিষ্ট টাকার উপরেও অনেক দামি দামি উপহার দিলেন। সেকথাও পুণ্যলতা জানান।

কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে যে নারীসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাঁর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন কাদম্বিনী ১৯০৮ সালে তিনি কলকাতায় এক জনসভার আয়োজন করেন। তিনি নিজে এই সভায় সভানেতৃত্ব করেন। গান্ধীজির নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে আন্দোলনরত সত্যাগ্রহীদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। এইসব সত্যাগ্রহীর সহায়তাকল্পে তিনি একটি তহবিল গঠন করেন এবং অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগী হন। ১৯১৪ সালে গান্ধীজির কলকাতা ভ্রমণকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে সভার আয়োজন করে কাদম্বিনী তাতে সভানেত্রী হন।

কাদম্বিনী ছিলেন প্রকৃত মানবতাবাদী। মালিকদের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণির শোষণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করতেন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অবিলম্বে এই শোষণের অবসান ঘটানো উচিত। আসামের চা বাগানে শ্রমিক নিয়োগের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর স্বামীর বিবৃতি তিনি সমর্থন করেন। ১৯২২ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত এক তদন্ত কমিশনের পক্ষ থেকে তিনি কবি কামিনী রায়ের সঙ্গে কয়লাখনির নারী শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। ঘনিষ্ঠ বান্ধবী স্বর্ণকুমারী দেবীর বহু কল্যাণমূলক কাজেও সহায়তা করেন।

বাইরে যে মহিলা এমনই প্রগতিশীল, সমাজের অনুশাসন তাঁকেও মেনে চলতে হত। হিন্দু মহিলারা লেডি ডাক্তারের সঙ্গে সবরকম সামাজিক সম্পর্ক বাঁচিয়ে চলতেন। সন্তান প্রসবের পরে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ডাক্তারকে খেতে হয়েছে দাসীদের খাবার দালানে। এঁটো পাতা নিজেকে ফেলতে হয়েছে কোনো দাসী তা স্পর্শ করবে না বলে। সামাজিক নিমন্ত্রণে এসে লেডি ডাক্তারের ছোঁয়া বাঁচিয়ে খেতে বসেছেন মেয়েরা, তাঁর স্পর্শ করা খাদ্য গ্রহণ করার তো প্রশ্নই উঠে না। মজার ব্যাপার হলো সাধারণ নারীরা এসব ব্যাপারটা নিয়ে বেশ হৈ চৈ করলে। কাদম্বিনী এসব গায়ে মাখতেন না কিংবা হেসে উড়িয়ে দিতেন।

কাদম্বিনীর চিকিৎসক জীবনের শুরুটা মোটেও বর্ণময় নয়। যে কোনো চিকিৎসকের জীবনে এই সময়টা সবচেয়ে কঠিন সময়। কাদম্বিনীকে অবশ্য ইডেন হাসপাতালে কাজ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন ডাঃ কোট্স। যদিও সেখানে তাঁর মর্যাদা ছিল ধাত্রীর সমতুল্য। তিনি ৪৫/৫ নং বেনেটোলা লেনে চেম্বার খুলে বসেন। কিন্তু ডাক্তার হিসেবে প্রার্থিত কাজ তিনি পাচ্ছিলেন না, তাঁর ইচ্ছে ছিল একটি ওয়ার্ডের ভার নেওয়া কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কোনো ভারতীয়কে সে মর্যাদা দিতে রাজী নয়। ১৮৯০ সালে কাদম্বিনী লেডি ডাফরিন হাসপাতালে মর্যাদাপূর্ণ চাকরি পান উচ্চ বেতনে। তিনশত টাকা মাসিক।

কাদম্বিনী ভালো ডাক্তার ছিলেন। কড়া কড়া অপ্রিয় সত্যি বলতে দ্বিধা করতেন না। নিজের ছেলেমেয়েদেরও বাদ দিতেন না। পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর কন্যা ছিলেন। জ্যোতির্ময়ী যখন বেথুনে পড়তেন পোশাকে নিয়মভঙ্গ

করে চৌখুপী ডুরে শাড়ি জামার বড়ো গলা পরলে বকুনি খেতেন। কাদম্বিনী নিজে শৌখিন ছিলেন কিন্তু অকারণে তথাকথিত আধুনিকতাকে বড়ো করে দেখতেন না।

কাদম্বিনীর মৃত্যুও মহান। তিনি জীবনের শেষ দিন অবধি কাজ করেন। শেষ দিকে রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ায় রোগী দেখা অনেক কমিয়ে দেন। একটি অস্ত্রোপচার করেন সেদিন। ১৯২৩ সালের ৩রা অক্টোবর শেষ রোগী দেখে পারিশ্রমিক পান পঞ্চাশ টাকা। সেই টাকাতেই তাঁর শেষকৃত্য হয়। মহীয়সী কাদম্বিনীর জীবনে এই ভাবেই যবনিকা নেমে আসে। প্রণাম। তাঁকে প্রণাম।